# অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হতে হবে

**চিররঞ্জন সরকার**
২৭ নভেম্বর ২০২৩, ১২:০০ এএম

এ বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটোই কমেছে। এ বছর দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৭৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় গড় পাসের হার ছিল ৮৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ। সেই হিসেবে এবার পাসের হার কমেছে ৭ দশমিক ৩১ শতাংশ। একই সঙ্গে কমেছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় অর্ধেকে নেমেছে। এবার দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সাড়ে ১৩ লাখের বেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৯২ হাজার ৩৬৫ জন। গেল বছর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৭৬ হাজার ২৮২ জন। সেই হিসাবে এ বছর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৮৩ হাজার ৯১৭ জন। পাসের হারে এবারও এগিয়ে ছাত্রীরা। ছাত্রীদের পাসের হার ৮০ দশমিক ৫৭ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ৭৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ। করোনা ভাইরাস মহামারী শুরুর পর এবারই পূর্ণ নম্বর ও পূর্ণ সময়ে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

ফলাফল হাতে পেয়ে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, আনন্দ আর হৈ-হুল্লোড়ে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। প্রত্যাশিত ফলের ছাপ যেন ছিল তাদের চোখে-মুখে। সন্তানের ফলে খুশি অভিভাবকরাও। রোববার সকাল থেকেই ফলাফল জানতে কলেজে আসতে শুরু করে শিক্ষার্থীরা। দীর্ঘ সাধনা-পরিশ্রমের পর ভালো ফলের আনন্দ ভাগাভাগি করে সহপাঠীর সঙ্গে। ঢাকঢোল পিটিয়ে, ছবি আর সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা।

যারা পাস করেছে তাদের অবশ্যই শুভকামনা ও অভিনন্দন জানাতে হবে। কারণ কৃতিত্বকে সম্মান জানানো যে কোনো দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। তবে অকৃতকার্য হওয়া ২১ দশমিক ৩৩ ভাগ শিক্ষার্থীর ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দরকার। চলতি বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ৩ লাখ ৭ হাজার শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৭ হাজার ৬৬০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার ফরম পূরণ করলেও পরীক্ষায় অংশ না নিয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন। আর ২ লাখ ৯০ হাজার ৬৩ জন পরীক্ষার্থী এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করতে পারেননি। তাদের জন্য সবাইকেই সহানুভূতিশীল হতে হবে। কৃতকার্যদের নিয়ে অধিক সমারোহে আপাত ব্যর্থরা যেন দৃষ্টির আড়ালে চলে না যায়, তারা যেন হীনম্মন্যতায় না ভোগে সেটাই এ মুহূর্তে শিক্ষক-অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। কোনো শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হলে কিংবা কম গ্রেড পেলে তা শিক্ষার্থীর দোষ নয়। এটি শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা। কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এজন্য শিক্ষার্থীদের ওপর দায় চাপানো হয়। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। এ ধরনের স্থূল মনোভাব থেকে আমাদের সবাইকেই বেরিয়ে আসতে হবে।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও গ্রামের তুলনায় শহরের, বিশেষত রাজধানীর নামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরাই ভালো ফল করেছে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত মোবাইল ফোননির্ভর হয়ে পড়া, স্কুলকে গুরুত্ব না দেওয়া, শিক্ষক-অভিভাবকদের উদাসীনতা, সামর্থ্যবান অভিভাবকদের ইংরেজি মাধ্যমের দিকে ঝুঁকে পড়াকে যেমন দায়ী করা হচ্ছে, পাশাপাশি কারিকুলাম ও পরীক্ষাপ্রণালির ক্ষেত্রে নিত্যনতুন নিয়ম-পদ্ধতিকেও দায়ী করছেন অনেকে। তাদের মতে, শিক্ষা নিয়ে লাগাতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোয় অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরাই নিয়ম-পদ্ধতি ভালোভাবে বুঝতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীদেরও তারা এসব নিয়ম-পদ্ধতি বোঝাতে পারেন না। এর প্রভাব পড়ে পরীক্ষার ফলে। কেউ কেউ সরাসরি জেলার শিক্ষা প্রশাসনের ঢিলেঢালা মনোভাবের দিকে আঙুল তুলেছেন। কেউ জানাচ্ছেন, শিক্ষণে পেশাদার মনোভাবের অভাবের কথা। এসব অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের শাসনব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সেই পদ্ধতিটিই মোটামুটি চালু রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশে। গত ৫৩ বছরে তার কিছু সংস্কার হয়েছে, তবে অধঃপতনই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যাচর্চা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় পাস ও ফেল। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর তারা কতটা বিদ্যা অর্জন করেছে, তার একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হয়, কেউ বা অকৃতকার্য। যার প্রচলিত নাম পাস বা ফেল। ফেলের কোনো ডিভিশন বা গ্রেড নেই, কিন্তু পাসের ডিভিশন বা গ্রেড রয়েছে। এই উপমহাদেশে পরীক্ষায় অতি ভালো ফলাফল করে কেউ আনন্দ-উল্লাস করতে গিয়ে বুক ফেটে মারা যায়নি। কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করে গত ৫৩ বছরে আত্মহত্যা করেছে অন্তত হাজারখানেক শিক্ষার্থী।

দুঃখে হার্টফেল করে মারা গেছেন বহু বাবা-মা। এসব অপমৃত্যুর জন্য দায়ী আমরাইÑ আমাদের সমাজ। আমরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফলকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে হইচই করি বলেই তারা লজ্জায় আত্মহননের পথ বেছে নেয়। বিদ্যার্জন সম্পর্কে আমাদের ধারণা বৈষয়িক বলেই পাস-ফেল নিয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় ভালো ফল করা খুবই গৌরবের কথা। কিন্তু ফেল করলেই জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

একটা বোর্ডের পরীক্ষা কি কোনো কিশোর বা কিশোরীর ভবিষ্যৎ জীবনকে নির্ধারিত করে দেয়? ঠিক করে দিতে পারে সে ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে? নিশ্চয়ই নয়। আসলে আমাদের জীবনের চলার পথে আরও অসংখ্য পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এবং সেই প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফলই ঠিক করে দেয় আমরা কোথায় পৌঁছব বা দাঁড়িয়ে থাকব।

তা হলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা বোধহয় সমাজের। আমাদের দেশে শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিরাও এভাবে ভাবতে শেখেননি। পরের প্রজন্মকেও শেখাতে পারেননি। সেজন্যই প্রতিবার যখন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়, তখন ছাত্রছাত্রীদের হতাশায় ভুগতে দেখা যায়। কেউ কেউ হয়তো গভীর মানসিক অবসাদে আত্মহননের মতো চরম পন্থা বেছে নেন। আমাদের ক্রিকেট দলকে যেমন খেলতে নামতে হয় প্রত্যাশার গগনচুম্বী চাপ মাথায় নিয়ে এবং গোটা দেশবাসী ক্রমাগত ভেবে যাবে এরা আজ অবশ্যই জিতবে, সেরা হবে, তেমনই আমরা আমাদের সন্তানদের পরীক্ষা দিতে পাঠাই প্রত্যাশার পারদ মাথায় চাপিয়ে দিয়ে। আমরাও তাদের কানের কাছে ক্রমাগত বলে যেতে থাকি, তোমাকে পয়লা নম্বর হতেই হবে। যেন পরীক্ষায় সেরা না হতে পারলে জীবনই বৃথা। এটা এক ধরনের অসুস্থ প্রবণতা।

আমাদের দেশে এইচএসসি বা সমমানের পাবলিক পরীক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে প্রবেশের সুযোগ ঘটে। জীবনের নতুন দরজা খুলে যায়। প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষায় ফল প্রকাশিত হলে পাসের রেকর্ড দেখে আমরা উৎফুল্ল হই। ভাবি দেশে যত ছেলে পাস করছে ততই শিক্ষায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি বিষয় আমরা আমলে নিই না যে, পাস মানেই শিক্ষার মানোন্নয়ন, মেধার বিকাশ এক নয়। এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে বিদগ্ধ লেখক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়। অথচ তা আমরা স্বীকার করতে চাই না বলে আজ শিক্ষার মান নিয়ে এত অভিযোগ। আসলে পাস করা ও শিক্ষিত হওয়ার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

এখন যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলেন তারা দুই চার-পাঁচ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করবেন। কেউ হবেন চিকিৎসক, কেউ প্রকৌশলী-স্থপতি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা প্রভৃতি। আট-দশ বছরের মধ্যে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব বর্তাবে তাদের ওপর। কেউ হবেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সেনাবাহিনীর জেনারেল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, পোশাকশিল্প ও কলকারখানার মালিক। যারা কোনো কিছুই হতে পারবেন না, তারা হয়তো বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করতে হয়। তবে মনে রাখা দরকার, যে শিক্ষা আপনাকে পর করে, শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে, সে শিক্ষা নিয়ে কী লাভ? যে চিকিৎসক ঢাকা মেডিক্যাল থেকে পাস করে একটি বছরও তার গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা দেবেন না, তার ভালো ফলাফলে গ্রামের মানুষের অহংকার করার কী আছে? বাংলাদেশকে অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা একটি মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করার দায়িত্ব আজ যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তাদের। তবে শুধু তাদের নিয়ে বসে থাকলেই চলবে না। যারা অকৃতকার্য হয়েছেন, তাদের এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। যখন সবাই মিলে এগিয়ে যাওয়ার পথ রচনা করা সম্ভব হবে, তখন সেটাই হবে প্রকৃত উদযাপন।

চিররঞ্জন সরকার : কলাম লেখক